(P. C. Joshi)-এর মতে, প্রত্যক্ষ ...
ভূমিসংস্কার।

প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী ভূমিসংস্কার বলতে সেই সমস্ত সাংগঠনিক পরিবর্তনকে বোঝানো হয়, যার ফলে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা প্রকৃত কৃষকের স্বার্থের অনুকূলে আসে এবং কৃষিজোতের আয়তন এমনভাবে বৃদ্ধি করা হয় যাতে তা লাভজনক হয়ে ওঠে।

আধুনিক ধারণা অনুযায়ী ভূমিসংস্কার বলতে সেই সমস্ত সাংগঠনিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনকে বোঝানো হয়, যার ফলে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা প্রকৃত কৃষকের অনুকূলে আসে এবং জমির ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচ ও অতিরিক্ত উৎপাদনের সুবিধা অর্জনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ যোগায়।

ভারতের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে ভূমিসংস্কারের গুরুত্ব অপরিসীম। সঠিক ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা কৃষি উন্নয়নের ...

ভূমিসংস্কারের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ভারতে ভূমিসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতে ভূমিসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আলোচনা করা হল ঃ

(১) **কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ঃ** ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে কৃষিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়, ফলে কৃষিজমির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। বড় জোতের মালিক প্রচুর জমির অধিকারী বলে তারা নিবিড়ভাবে জমি চাষ করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে উৎসাহী হয় না। বড় জোতের মালিকদের আয়ের একাধিক উৎস থাকে। তাই কিছু জমি পতিত থাকলেও তাদের কিছু অসুবিধা হয় না। তাছাড়া এই সমস্ত জমির মালিকরা কৃষি থেকে উদ্বৃত্ত অর্থ কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ না করে শহরাঞ্চলে বড় বড় গৃহ নির্মাণ, গাড়ি ইত্যাদিতে অর্থ বিনিয়োগ করে। এইভাবে কৃষি মূলধন কৃষি থেকে অকৃষি ক্ষেত্রে স্থানান্তর হয়। কিন্তু ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে প্রকৃত চাষী জমির মালিক হওয়ার ফলে নিজের জমিতে অধিক পরিশ্রম, বিনিয়োগ এবং কৃষি উপাদানগুলি সর্বোচ্চ দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতে চেষ্টা করে। তাছাড়া ছোট জোতের মালিকের আয়ের বিকল্প উৎস না থাকায় জোতকে কেন্দ্র করেই জীবন ও জীবিকার সংস্থান করতে চেষ্টা করে। ফলে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, কৃষকের আয় বৃদ্ধি পায়, সঞ্চয় বৃদ্ধি পায় ও কৃষিতে পুনঃ বিনিয়োগের পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকে। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন, অধ্যাপক রঞ্জিত সাউ, অধ্যাপক সুখময় চক্রবর্তী প্রমুখ অর্থনীতিবিদ, যাঁরা ভারতে কৃষি কাঠামোর ছোট জোত (জমি) বেশি উৎপাদনশীল বলে মনে করেন তাঁদের অনুসরণে অনেকের অভিমত হল, ভারতের ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে বড় জোতের মালিকানার অবসান ঘটিয়ে ছোট জোতের মালিকানায় রূপান্তরিত করতে পারলে ভারতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

(২) **উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যয়হীন পদ্ধতি ঃ** কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি প্রধানত দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। একটি হল প্রতিষ্ঠানগত বিষয় অর্থাৎ জমির স্বত্ব সম্পর্কীয় বিষয় এবং অপরটি হল কৃৎকৌশলগত বিষয়। কৃৎকৌশলগত বিষয়ের মধ্যে আছে উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার, রাসায়নিক সারের ব্যবহার, সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ইত্যাদি। সুতরাং কৃৎকৌশলের উন্নতির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হলে কৃষিতে প্রচুর পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন। ভারতে যার বিশেষ অভাব আছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ হল প্রতিষ্ঠানগত বিষয়ের সংস্কার অর্থাৎ ভূমিসংস্কার। প্রকৃতপক্ষে ভূমিসংস্কার কৃষিক্ষেত্রে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করে, যার ফলে প্রকৃত কৃষক জমি চাষে উৎসাহ ও প্রেরণা পায়। সে নিজের শ্রম ও পরিচালন ক্ষমতা প্রয়োগ করে জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে সর্বাগ্রে অগ্রসর হয়। কারণ, প্রকৃত চাষী জমির স্বত্ব পাওয়ায় জমির সঙ্গে তার আত্মিক যোগাযোগ ঘটে। এর ফলে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এই পদ্ধতিতে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে কৃষিতে অতিরিক্ত বিনিয়োগ না করে। সেইজন্যই বলা যায়, ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির পদ্ধতি প্রায় ব্যয় শূন্য বা ব্যয়হীন।

(৩) **সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ঃ** ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের বণ্টন করে দিলে জমি মালিকানায় একচেটিয়া অবস্থার অবসান ঘটে এবং গ্রামাঞ্চলে আয় বৈষম্য কিছুটা হ্রাস করা সম্ভব হয় এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কিছুটা সম্ভব হয়। তাছাড়া ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে কৃষকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে পারে এবং গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত স্তরে উন্নয়ন পরিকল্পনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এইভাবে ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে দরিদ্র কৃষকদের অধিকারবোধ জাগ্রত হয় বলে তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সমস্ত কিছুতেই আগ্রহী হয়ে ওঠে। সেই জন্যই বলা যায়, প্রকৃত ভূমিসংস্কার গ্রামাঞ্চলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার এক শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

(৪) **জনাধিক্যের সমস্যার সমাধান ঃ** ভারত একটি জনবহুল দেশ এবং এই জনসংখ্যার বেশির ভাগই বাস করে গ্রামাঞ্চলে। ভারতের এই জনাধিক্যের সমস্যার আংশিক সমাধান ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে সম্ভব। প্রকৃত ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে বণ্টন করতে পারলে বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে জমিতে সরাসরি নিযুক্ত করা সম্ভব হবে। এইভাবে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পর্যায়ক্রমে গ্রামাঞ্চলে পশুপক্ষীপালন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের সঙ্গে যুক্ত করে জমির উপর চাপ হ্রাস করে আরও বেশি সংখ্যক ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা যেতে পারে। সুতরাং ভারতের ন্যায় কৃষিনির্ভর দেশে ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে জনাধিক্যের সমস্যার কিছুটা সমাধান করা সম্ভব।

Scanned with CamScanner

(৫) **অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কাজ সহজ ও সরল হয় ঃ** ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে সমস্ত প্রকারের মধ্যস্বত্বভোগীর বিলোপ করে সারা দেশে একই ধরনের কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তন করে এক অভিন্ন কৃষি নীতি অনুসরণ ও রূপায়ণ করে ভারতের কৃষি অর্থনীতিকে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে আনা সম্ভব হয়। এর ফলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কাজ সহজ ও সরল হয়।

(৬) **প্রকৃত চাষীর পরিকল্পনা ও উন্নয়নের সুফল অর্জন ঃ** ভূমিসংস্কার যুক্তিসংগত কৃষিব্যবস্থা সৃষ্টি করে দেশের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি করতে পারে। এছাড়া ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কাজে কৃষির সঙ্গে যুক্ত জনসাধারণের সহযোগিতা অর্জন করা সম্ভব হয়। ফলে প্রকৃত চাষীও ভাবতে শেখে সে নিজেও পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি উপাদান। ফলে প্রকৃত চাষী পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফলও অর্জন করে ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে।

● **৬.১.৩. ভারতের ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্য (Objectives of Land Reforms in India) ঃ** ভারতের পরিকল্পনা কমিশন ভারতের ভূমি সংস্কারের দুটি মূল উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন। ভারতের ভূমি সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য দুটি হল—

(১) অতীতের কৃষি কাঠামোর জন্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পথে যে সমস্ত বাধা আছে, সেই সমস্ত বাধা দূর করে দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির উপযোগী কৃষি কাঠামো গড়ে তোলা।

(২) কৃষিক্ষেত্রে সমস্ত রকমের অন্যায় ও অবিচারের অবসান ঘটিয়ে গ্রামাঞ্চলে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা।

সুতরাং ভারতের ভূমি সংস্কার একদিকে পুরাতন কৃষি পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে আধুনিক যুগের উপযোগী গতিশীল ও বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতির প্রবর্তনের পথ প্রশস্ত করবে এবং অপরদিকে কৃষিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন ঘটিয়ে উন্নত কৃষি ব্যবস্থার অনুকূলে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করবে।

● **৬.১.৪. ভারতে ভূমি সংস্কারের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থা (Measures adopted for Land Reforms in India) ঃ** স্বাধীনতা লাভের পর বিশেষ করে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হওয়ার পর ভূমি সংস্কারের মৌলিক উদ্দেশ্য সামনে রেখে ভারতে ভূমি সংস্কারের কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়। ভারতের ভূমি সংস্কার কার্যসূচীর মূলনীতিগুলি হল ঃ

(১) মধ্যস্বত্বভোগীর বিলোপসাধন।

(২) প্রজাস্বত্ব সংস্কার।

(৩) জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ।

(৪) জোতের উপবিভাজন ও খণ্ডীকরণ রোধ করে জোতের সংহতি সাধন সহ কৃষির পুনর্গঠন।

(৫) সমবায় চাষ প্রবর্তন।

ভারতের ভূমি সংস্কার কার্যসূচীর মূলনীতিগুলি আলোচনা করা হল ঃ

(১) মধ্যস্বত্বভোগীর বিলোপসাধন (Abolition of Intermediaries) ঃ স্বাধীনতার আগে ভারতে মূলত জমিদারী, রায়তওয়ারী ও মহলওয়ারী ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সামন্ততান্ত্রিক এই ভূমিব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রাধান্য ছিল খুব বেশি। ফলে সরকার ও কৃষকদের মধ্যে সরাসরি সংযোগ ছিল না। স্বাধীনতার পর ভূমি সংস্কারের অন্যতম ব্যবস্থা হিসাবে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আগেই বেশ কয়েকটি রাজ্যে মধ্যস্বত্বভোগীর বিলোপ সাধনের কাজ শুরু হয়েছিল। এখানে যদিও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সরকার ও কৃষকদের মধ্যে সমস্ত রকমের মধ্যস্বত্বভোগীর অপসারণ। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, শুধুমাত্র জমিদারী ব্যবস্থার উচ্ছেদ। অবশ্য পরবর্তীকালে প্রায় সমস্ত রাজ্যই মধ্যস্বত্বভোগী বিলোপ সাধনের আইন পাস করে। 1954-55 সালের মধ্যেই মধ্যস্বত্বভোগীর একটি অংশের বিশেষত জমিদার শ্রেণীর সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে। এর ফলে 173 মিলিয়ন একর জমি উদ্ধার করা হয় এবং 20 মিলিয়ন কৃষকের সঙ্গে সরকারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং বহু পতিত জমি এবং ব্যক্তিগত মালিকানার অধীন বনভূমির স্বত্ব রাষ্ট্রের হাতে আসে।

কিন্তু একথা জানা দরকার যে, শুধুমাত্র জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন ঘটেছে, অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীর বিলোপ সাধন ঘটেনি। তাই এখনও কয়েকটি অঞ্চলে মধ্যস্বত্বভোগীদের সন্ধান মেলে। যেমন বর্তমানে বহু অঞ্চলে জমিদারদের স্থান দখল করেছে বড় জোতদার।

(২) প্রজাস্বত্ব সংস্কার (Tenancy Reforms) ঃ অন্যের জমি যারা খাজনার বিনিময়ে চাষ করে তাদের প্রজা বলা হয়। আবার প্রজাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাকে বলা হয়

Scanned with CamScanner

প্রজাস্বত্ব সংস্কার। ভারতে মধ্যস্বত্বভোগী বিলোপ সাধন আইন পাস হওয়ার পরেও বহু ক্ষেত্রে কৃষক জমির স্বত্ব না পেয়ে প্রজা বা উপপ্রজা থেকে যায়। এই কারণে প্রজাস্বত্ব সংস্কারের মাধ্যমে প্রজার স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ভারতে প্রবর্তিত ভূমি সংস্কার আইনের প্রজাস্বত্ব সংস্কারকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) খাজনা নিয়ন্ত্রণ।

(খ) প্রজাস্বত্বের নিরাপত্তা প্রদান।

(গ) প্রজাকে জমির মালিকানা প্রদান।

(ক) খাজনা নিয়ন্ত্রণ ঃ প্রজাস্বত্ব সংস্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল খাজনা নিয়ন্ত্রণ। ভূমি সংস্কার আইন প্রবর্তন হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রজা কৃষকদের উচ্চহারে খাজনা প্রদান করতে হতো। খাজনা সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন নির্দেশ দেয়, খাজনা কোনো ক্ষেত্রেই মোট উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশের বেশি এবং এক-পঞ্চমাংশের কম হবে না। পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন রাজ্যে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ অনুসারে খাজনা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে প্রজা-কৃষকদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা চলছে। এখনও কিন্তু বহু রাজ্যেই পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ মানা হচ্ছে না। এছাড়া খাজনা নিয়ন্ত্রণের আইন পাস হলেও বিভিন্ন রাজ্যের আইনে তারতম্য দেখা যায়।

(খ) প্রজাস্বত্বের নিরাপত্তা প্রদান ঃ স্বাধীনতার পর প্রজা-কৃষকদের স্বত্বের (Tenancy rights) নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন রাজ্যে আইন পাস করা হয়েছে। প্রজাস্বত্ব নিরাপত্তা প্রদান আইনে বলা হয়েছে জমি থেকে প্রজা-কৃষকদের বেআইনিভাবে উচ্ছেদ করা যাবে না। অর্থাৎ প্রজা-কৃষকদের স্বত্বের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়াও এই আইনে বলা হয়েছে, জমির মালিক যদি নিজে জমি চাষ করতে চায় তবেই প্রজা-কৃষকের চাষের জমির একাংশ বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ও বিশেষ বিশেষ শর্তে ফেরৎ দেওয়া হবে। এই সকল ক্ষেত্রেও কিন্তু প্রজা-কৃষককে ন্যূনতম পরিমাণ জমি রাখার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া পত্রে আক্ষেপ করে বলা হয়েছে, ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে প্রজাস্বত্বের নিরাপত্তা আইনে প্রজা-কৃষকদের অধিকার সুনিশ্চিত নয়।

(গ) প্রজাকে জমির মালিকানা প্রদান ঃ প্রজাস্বত্ব সংস্কারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রজাকে জমির মালিকানা প্রদান। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের আইন পাস করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রজাবিলি জমির সম্পূর্ণ বা একাংশ কিনে নেওয়ার অধিকার প্রজাকে দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য থেকে অনুমান করা হচ্ছে, সারা ভারতে সমস্ত রাজ্য মিলিয়ে মোট 124·2 লক্ষ প্রজা 156·3 লক্ষ হেক্টর জমির মালিকানা স্বত্ব লাভ করেছে।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, প্রজাস্বত্ব সংস্কারের জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যে আইন পাস করা হয়েছে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকায় এই ব্যাপারে অগ্রগতি আশানুরূপ হয়নি।

(৩) জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ (Ceiling on Land Holding) ঃ ভারতে ভূমি সংস্কারের উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা হল জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ। একটি কৃষক পরিবারের অধীনে সর্বোচ্চ কি পরিমাণ জোত থাকবে, তা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার নামই হল **জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ**। দেশের মোট কৃষিজমি যাতে মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত না হয় সেদিকে নজর রেখেই জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের নীতি গ্রহণ করা হয়। মুষ্টিমেয় কয়েকটি অঞ্চল বাদে প্রায় সব রাজ্যেই জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত আইন পাস করা হয়। এই আইনের দ্বারা প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন বা প্রায় ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়, যাতে কৃষিজমির মালিকানার ক্ষেত্রে অসম বণ্টন দূর হয়।

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, গোয়া ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চল (North-East region) ছাড়া সব রাজ্যেই এই আইন পাস করা হয়েছে। 2015 সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত 6·7 মিলিয়ন হেক্টর জমি উদ্বৃত্ত ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে 6·1 মিলিয়ন হেক্টর জমি 5·78 মিলিয়ন ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন করা হয়। ভারতের মোট কর্ষিত জমির 2 শতাংশেরও কম উদ্বৃত্ত বলে ঘোষণা করা হয় এবং মোট কর্ষিত জমির মাত্র 1 শতাংশ বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার এই বিশেষ দিকটিতেও সাফল্য আসেনি। অনেকের মতে রাজ্য সরকারগুলির সদিচ্ছার অভাব, প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, স্বার্থান্বেষী চক্রের ষড়যন্ত্র এর জন্য দায়ী।

Scanned with CamScanner

(৪) জোতের উপবিভাজন ও খণ্ডীকরণ রোধ করে জোতের সংহতি সাধন সহ কৃষির পুনর্গঠন (Agrarian Reorganisation including Consolidation of holdings and Prevention of Sub-division and Fragmentation) : ভারতীয় কৃষির স্বল্প উৎপাদনশীলতার অন্যতম কারণ হল ভারতের কৃষি জমিগুলি অতিমাত্রায় ক্ষুদ্র ও বিভক্ত। ভারতের ভূমি সংস্কার কার্যসূচী অনুসারে ভবিষ্যতে জমির খণ্ডীকরণ ও উপবিভাজন রোধ করার জন্য কয়েকটি রাজ্যে জোতের সংহতি সাধন সংক্রান্ত আইন পাস করা হয়েছে। এই আইন অনুসারে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা পাওয়ার উদ্দেশ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো মোট জমির বিনিময়ে সমপরিমাণ জমি একই স্থানে কৃষককে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে এই আইন কোথাও বাধ্যতামূলক, আবার কোথাও স্বেচ্ছামূলক। এছাড়াও কয়েকটি রাজ্যে এখনও এই সংক্রান্ত কোনো আইন পাস করা হয়নি (যেমন তামিলনাড়ু, কেরল ইত্যাদি)। কিন্তু অধিকাংশ রাজ্যেই একটি নির্ধারিত ন্যূনতম সীমার পর উপবিভাজন ও খণ্ডীকরণ রোধ করার জন্য আইন পাস করা হয়েছে বা ভূমি সংস্কার আইনে ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জোতের সংহতি সাধনের কাজ সন্তোষজনক না হওয়ার জন্য জমি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় নথির অভাব, জমির দামের পার্থক্য, সেচসেবিত এলাকার জমির সঙ্গে অন্য এলাকার জমির বিনিময়ে অসুবিধা, অর্থের অভাব প্রভৃতিকে দায়ী করা যেতে পারে।

(৫) সমবায় চাষ প্রবর্তন (Co-operative Farming) : ভারতের ভূমি সংস্কারের উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য হল কৃষিক্ষেত্রে সমবায় চাষ পদ্ধতি প্রবর্তন। জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের ফলে জোতের পরিমাণ ছোট ও বিক্ষিপ্ত হওয়ায়, এই সমস্ত জোতে সমবায় চাষ পদ্ধতির প্রবর্তন করে বৃহদায়তন চাষ ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সমবায় চাষ প্রবর্তন সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত ভারতের কোনো রাজ্য সরকারই আইন পাস করেনি। তবে চাষীরা স্বেচ্ছায় সমবায় সমিতি স্থাপন করলে জল ও সারের দাম, সরকারি পরামর্শদাতার সাহায্য, ট্রাক্টর ব্যবহারের সুযোগ ইত্যাদি সুবিধা দেওয়ার কথা কয়েকটি রাজ্যের ভূমি সংস্কার আইনে (যেমন পশ্চিমবাংলা) বলা হয়েছে।

বাস্তবে কিন্তু ভারতের সমবায় চাষের অগ্রগতি কিছুই হয়নি। কারণ 1980 সালের জুন মাস পর্যন্ত ভারতে সমবায় কৃষি খামারের সংখ্যা ছিল 11,000, সদস্যসংখ্যা ছিল 3·85 লক্ষ এবং এদের অধীনস্ত জমির পরিমাণ ছিল 6·04 লক্ষ হেক্টর। ফলে ভারতের মোট কর্ষিত জমির 0·4 শতাংশ এবং ভারতীয় চাষীর মাত্র 2 শতাংশ সমবায় চাষের আওতায় এসেছে।

● ৬.১.৫. ভারতে ভূমি সংস্কার কার্যসূচীর মূল্যায়ন (Evaluation of Land Reforms in India) : ভারতে ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়েছে তা বোঝা যাবে ভারতের ভূমি সংস্কার কার্যসূচীর মূল্যায়ন থেকে। ভারতে ভূমি সংস্কারের কাজ কতটা সাফল্য লাভ করেছে তা প্রথমে আলোচনা করা হল।

প্রথমেই উল্লেখ করা যায় যে, মধ্যস্বত্বভোগী বিলোপ সাধনের ফলে প্রায় 2 কোটি কৃষকের সঙ্গে সরকারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং বহু পতিত জমিও ব্যক্তিগত মালিকানার অধীন বনভূমির স্বত্ব রাষ্ট্রের হাতে এসেছে।

প্রজাস্বত্ব সংস্কারের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্যে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ অনুসারে খাজনা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে প্রজা কৃষকদের অবস্থার উন্নতি কিছুটা করা হয়েছে। প্রজা কৃষকদের স্বত্বের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে বিভিন্ন রাজ্যে এই সংক্রান্ত আইন পাস করে। এছাড়াও প্রজাস্বত্ব সংস্কারের মাধ্যমে ভারতে মোট 124·2 লক্ষ প্রজা 156·3 লক্ষ হেক্টর জমির মালিকানা স্বত্ব অর্জন করেছে।

জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত আইন পাস হওয়ার ফলে 2015 সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত 6·7 মিলিয়ন হেক্টর জমি উদ্বৃত্ত ঘোষণা করা হয়েছে এবং এর মধ্যে 6·1 মিলিয়ন হেক্টর জমি 5·78 মিলিয়ন ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে।

জোতের উপবিভাজন ও খণ্ডীকরণ রোধ করে জোতের সংহতি সাধন সহ কৃষির পুনর্গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে 2004 সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ভারতের মোট 1,633 লক্ষ একর জমি সংহতি সাধন করা সম্ভব হয়েছে।

ভূমি সংস্কারের কার্যসূচী হিসাবে সমবায় চাষ প্রবর্তনের ফলে 1980 সালের জুন মাস পর্যন্ত ভারতে সমবায় কৃষি খামারের সংখ্যা হল 11,000 এবং সদস্যসংখ্যা 3·85 লক্ষ এবং এদের অধীনস্থ জমির পরিমাণ হল 6·04 লক্ষ হেক্টর।

Scanned with CamScanner

ভারতে ভূমি সংস্কার কার্যসূচীকে অনেকে যথাযথ বলে অভিহিত করলেও **ভারতের ভূমি সংস্কার কার্যসূচীর ব্যর্থতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ভারতের ভূমি সংস্কারের ব্যর্থতা বা ত্রুটি আলোচনা করা হল।**

ভারতে মধ্যস্বত্বভোগীর বিলোপ সাধনের কাজ শুরু হলেও শুধুমাত্র জমিদারী প্রথার বিলোপ ঘটেছে। অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীর কিন্তু বিলোপসাধন ঘটেনি, তাই এখনও বহু স্থানে মধ্যস্বত্বভোগী জমির স্বত্ব ভোগ করছে। যেমন বর্তমানে বহুস্থানে জমিদারদের স্থান নিয়েছে বড় জোতদার।

প্রজাস্বত্ব সংস্কারের জন্য খাজনা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ বহু রাজ্যেই মানা হচ্ছে না। এছাড়া খাজনা নিয়ন্ত্রণের আইন পাস হলেও বিভিন্ন রাজ্যের আইনে তারতম্য লক্ষ করা যায়। তাছাড়া প্রজাস্বত্বের নিরাপত্তার জন্য আইন পাস করা হলেও বহু রাজ্যেই প্রজা কৃষকদের অধিকার সুনিশ্চিত নয়।

জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত আইন পাস হলেও এই বিশেষ দিকটিতে সাফল্য আসেনি রাজ্য সরকারগুলির সদিচ্ছার অভাবে।

সমবায় চাষ প্রবর্তন সংক্রান্ত কাজও উল্লেখযোগ্যভাবে কার্যকর হয়নি। কারণ এই সম্পর্কে পৃথকভাবে এখন পর্যন্ত কোনো রাজ্য সরকারই আইন পাস করেনি।

ভারতের ভূমি সংস্কার কার্যসূচীর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা যায় ভারতের ভূমি সংস্কার কার্যসূচী নানা দিক দিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। অর্থাৎ ভারতের ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্যগুলি সফল হয়নি। তার কারণ হল—

(১) **আইন পাস হতে বিলম্ব ঃ** ভারতের ভূমি সংস্কার আইনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কোনো আইন পাস হতে খুব বেশি সময় লাগে। ফলে সেই আইনের কার্যকারিতা কমে যায়।

(২) **পুরানো অর্থনৈতিক ও সামাজিক কেন্দ্র বর্তমান ঃ** গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তি কেন্দ্র এমনভাবে রয়েছে যাতে বড় জোতদারদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ সরকারি কর্মচারীরা উপেক্ষা করতে পারছে না।

(৩) **উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া ঃ** ভারতের ভূমি সংস্কার কর্মসূচী উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কৃষকদের সংগ্রামী আন্দোলনের মাধ্যমে এগুলি গ্রহণ করা হয়নি।

(৪) **উপযুক্ত নথিপত্রের অভাব ঃ** ভারতে জমিসংক্রান্ত নথিপত্র সঠিকভাবে রক্ষিত না হওয়ার ফলে, প্রজা কৃষকদের স্বার্থ সঠিকভাবে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না।

(৫) **ক্ষেতমজুরদের স্বার্থ উপেক্ষিত ঃ** ভারতের কৃষি উৎপাদনে ক্ষেতমজুরদের অবদান সবচেয়ে বেশি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতের ভূমি সংস্কার কার্যসূচীতে ক্ষেতমজুরদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি।

উপসংহারে বলা যায় যে, ভারতের ভূমি সংস্কারের কার্যক্রম নানা দিক দিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু একথা মনে রাখা উচিত যে, শুধুমাত্র ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ভূমি সংস্কার কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করে ঠিকই, কিন্তু কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হল জমির মালিকদের হাতে উপযুক্ত পরিমাণ সার ও বীজ সরবরাহ, প্রয়োজনীয় জলসেচের ব্যবস্থা, কীটনাশক ঔষধের ব্যবস্থা, উপযুক্ত পরিমাণ মূলধনের ব্যবস্থা ইত্যাদি। অর্থাৎ ভূমি সংস্কারের ফলে যারা জমির মালিক হবেন, তাঁরা যেন কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে যথার্থ দক্ষ হয়ে ওঠেন। সুতরাং **কৃষিক্ষেত্রে ভূমি সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত উন্নতি একই সঙ্গে করা প্রয়োজন।**

● **৬.১.৬. পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কার (Land Reform in West Bengal) ঃ** স্বাধীনতার পর ভূমি সংস্কারের কার্যক্রম

Scanned with CamScanner

হবে।

1977 সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। **অপারেশন বর্গা** পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি সংস্কারের এক উল্লেখযোগ্য দিক। **1977 সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বর্গা বা ভাগচাষের ক্ষেত্রে বর্গাদার বা ভাগচাষীর নাম নথিভুক্তকরণের ব্যবস্থা করে। ব্যাপক হারে বর্গা বা ভাগচাষীর নাম নথিভুক্তকরণের এই অভিযানকেই বলা হয় অপারেশন বর্গা।**

Scanned with CamScanner

❖ ৬.১.৭.১. **ভারতে জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি ঃ সুবিধা ও অসুবিধা (Arguments For and Against the Fixation of Land Holdings in India : Advantages and Disadvantages) ঃ** ভারতের ভূমিসংস্কারের উল্লেখযোগ্য একটি উপাদান হল জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ। একটি কৃষক পরিবারের অধীনে সর্বোচ্চ কি পরিমাণ জোত থাকবে, তা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার নামই হল জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ। ভারতে জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ আইন প্রবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু আইন প্রবর্তনের সপক্ষে যেমন কিছু যুক্তি দেখানো হয় তেমনি এর বিপক্ষেও বেশ কিছু যুক্তি দেখানো হয়। ভারতে জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি অর্থাৎ সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করা হল।

(ক) **ভারতে জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের সপক্ষে যুক্তি বা সুবিধা (Arguments for or Advantages of Fixation of Land Holdings in India) ঃ** ভারতের জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের সপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি দেখানো হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

(১) **সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা ঃ** ভারতের গ্রামাঞ্চলে জমি মালিকানার ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য বর্তমান এবং কৃষিজমির বেশিরভাগ অংশ মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারের হাতে কুক্ষিগত হয়েছে। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে সৃষ্টি হয়েছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য। জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হলে গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে সামাজিক বৈষম্য ও শোষণ হ্রাস করা সম্ভব হবে এবং সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সম্পদ ও আয় বৈষম্য হ্রাসের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবে।

(২) **কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ঃ** জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের ফলে যে উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া যাবে সেটি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা সম্ভব হবে। ফলে গ্রামের সর্বাপেক্ষা দরিদ্র কৃষকদের মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে এবং দরিদ্র কৃষক জমির উন্নতির জন্য এবং সামগ্রিকভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে আরও যত্নশীল হবে, ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের ফলে অনুকূল ভূমি ব্যবস্থা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করবে।

(৩) **নতুন মধ্যস্বত্বভোগীর আবির্ভাব বন্ধ করা যাবে ঃ** ভারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট করে না দিলে পুনরায় নতুন এক মধ্যস্বত্বভোগী আবির্ভাব ঘটবে বিভিন্ন ভাবে। এর ফলে আবার প্রজা, উপপ্রজা ইত্যাদি শ্রেণী সৃষ্টি হয়ে সরকার ও কৃষকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবে। তাই বলা হয় জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ হল নতুন মধ্যস্বত্বভোগীর আবির্ভাব বন্ধ করার সঠিক পদ্ধতি।

(৪) **সমবায় চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তনে সাহায্য করবে ঃ** জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন হলে তা সমবায় চাষ প্রবর্তনে সাহায্য করবে। এর দুটি কারণ আছে। প্রথমত বৃহৎ জোতের মালিকদের নিয়ে যদি সমবায় গঠন করা হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত সেটি ধনতান্ত্রিক যৌথ খামারে পরিণত হয় কিন্তু জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট থাকলে জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সমতা থাকায় সমবায় সমিতিগুলি প্রকৃত সমবায়ে পরিণত হতে পারবে। দ্বিতীয়ত জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট থাকলে যে সমস্ত উদ্বৃত্ত জমি সরকারের হাতে আসবে সেগুলি ভূমিহীনদের মধ্যে এই শর্তে বণ্টন করা যেতে পারে যে, তারা নিজেদের জমিগুলি একত্র করে সমবায়ের মাধ্যমে চাষ করবে। এইভাবে সমবায় চাষ ব্যবস্থার উপযোগী পটভূমিকা তৈরি করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতের মালিকদের বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা ভোগ করার পথ প্রসারিত করা সম্ভব হবে।

(৫) **গ্রামীণ দরিদ্র জনসাধারণের দারিদ্র্য হ্রাস পাবে ঃ** জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের ফলে যে উদ্বৃত্ত জমি সরকারের হাতে আসবে সেগুলি ভূমিহীন ও ক্ষেতমজুরদের মধ্যে পুনর্বণ্টন করে ঐ সমস্ত পরিবারগুলিকে দারিদ্র্যসীমার উপরে তুলে আনা সম্ভব হবে, কর্মসংস্থান পরিস্থিতির উন্নতির মাধ্যমে।

(৬) **চাষের আয়তন বৃদ্ধি পাবে ঃ** বড় জোতের মালিকের আয়ের একাধিক উৎস থাকায় সে কিছু জমি অনাবাদী অবস্থায় রাখতে পারে। তাই জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন ব্যক্তিদের মধ্যে বণ্টন করা হলে দরিদ্র কৃষক জমির মালিক হয়। দরিদ্র কৃষককে ঐ জোতকে কেন্দ্র করেই জীবন ও জীবিকার সংস্থান করতে হয় বলে জমিতে সারা বৎসর ধরে চাষ করার চেষ্টা চালায়, ফলে যে জমি চাষের অনুপযুক্ত বলে বড় জোতের মালিক অনাবাদী রাখতো তাকেও চাষের উপযুক্ত করে তোলে ঐ দরিদ্র কৃষক। ফলে দেশে চাষের গড় আয়তন বৃদ্ধি পায়।

Scanned with CamScanner

(৭) **গ্রামাঞ্চলে গণতন্ত্র সুদৃঢ় হবে ঃ** গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত কৃষকের বেশি জমি থাকে সেই সমস্ত কৃষক পঞ্চায়েত সহ অন্যান্য ক্ষেত্রের উপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ বেশি পায়। জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের ফলে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে এবং পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে গণতন্ত্র সুদৃঢ় হবে।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক **ভি. আর. গ্যাডগিল** জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ সমর্থন করে বলেছেন, সমস্ত উপাদানের মধ্যে জমির যোগান বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ অথচ তার দাবিদারের সংখ্যা অসংখ্য। সুতরাং কোনো ব্যক্তির অধিক পরিমাণ জমি ব্যবহার অসঙ্গত। শুধু তাই নয় বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জমির পুনর্বণ্টন বিশেষভাবে কাম্য।

(খ) **ভারতে জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের বিপক্ষে যুক্তি বা অসুবিধা (Arguments Against or Disadvantages of Fixation of Land Holdings in India) ঃ** ভারতে জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের বিপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি দেখানো হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

(১) **বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ সম্ভব হবে না ঃ** জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের ফলে বড় বড় সুসংহত কৃষি খামারগুলি ভেঙে যাবে এবং সৃষ্টি হবে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিজোতের এবং খণ্ডীকরণ ও বিক্ষিপ্ততার সমস্যাকে আরও বৃদ্ধি করবে। এর ফলে আধুনিক পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ সম্ভব হবে না।

(২) **সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় ঃ** জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের ফলে সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা কার্যক্ষেত্রে সম্ভব হবে না বলে অনেকে মনে করেন। **দাণ্ডেকর ও রথ** মনে করেন জোতের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের ফলে উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টনের প্রচেষ্টা বৈষম্য ও দারিদ্র্য দূরীকরণে কার্যকর হতে পারে না। কারণ জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের ফলে সরকারের হাতে অতি সামান্য পরিমাণ জমিই আসবে এবং এই জমির অধিকাংশই নিম্নমানের। এই সামান্য পরিমাণ জমি ভারতীয় কৃষকদের জমির প্রতি আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করবে। যারা জমি পেল এবং যারা পেল না তাদের মধ্যে সংঘাত দেখা দেবে এবং ভূমিহীন কৃষকদের মূল সমস্যার সমাধান হবে না। এছাড়া জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের ফলে কৃষকের আয়ের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হল অথচ শহরের অধিবাসীদের আয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের ব্যাপারে কিছুই করা হল না—এটি ন্যায় নীতির দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। **অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গা** (N. G. Ranga) মন্তব্য করেছেন, এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রাম ও শহরের মধ্যে আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য বৃদ্ধি করে। এইজন্যই বলা হয় জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

(৩) **কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত হ্রাস পাবে ঃ** জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের ফলে ভূমিহীন কৃষকদের উদ্বৃত্ত জমি বণ্টন করা হলে উৎপাদন হ্রাস পাবে। কারণ এই সমস্ত কৃষকদের আর্থিক সম্বল এত কম যে তাদের পক্ষে কৃষিকাজ সম্পাদন করা প্রায় অসম্ভব। ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের মোট উৎপাদন হ্রাস পাবে। তাছাড়া এরূপ আশঙ্কাও প্রকাশ করা হয় যে, জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের ফলে শুধু যে উৎপাদন হ্রাস পাবে তাই নয়, বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণও হ্রাস পাবে। কারণ বাজারে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের বেশিরভাগ অংশই বড় জোতের মালিকরা যোগান দিয়ে থাকে। ছোট জোতের কৃষক নিজের ও পরিবারের খাদ্যদ্রব্যের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে উৎপাদন করে। এই সমস্ত কারণে জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের বিষয়টি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাধারণ নীতি থেকে আলাদা করে দেখা ঠিক হবে না।

(৪) **ন্যায়সঙ্গত মানদণ্ড নির্ধারণের সমস্যা ঃ** ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ু, আবহাওয়া, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জমির উর্বরতার ক্ষেত্রে বিরাট পার্থক্য বর্তমান। সুতরাং জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা কোন্ নীতি অনুসারে গ্রহণ করলে তা ন্যায়সঙ্গত হবে সেটি নির্ধারণ করা খুবই কঠিন ব্যাপার।

(৫) **ক্ষতিপূরণ প্রদান সংক্রান্ত সমস্যা ঃ** জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের ফলে উদ্বৃত্ত জমির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার যে ব্যবস্থা আছে তা এতই কম যে এটিকে জমি থেকে উৎখাত বলা চলে। আবার ক্ষতিপূরণ বেশি দেওয়ার বিষয়টি চিন্তা করা হলে সেটি সরকারের দিক থেকেও গ্রহণযোগ্য হয় না।

(৬) **গ্রামাঞ্চলে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাবে ঃ** জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ আইন বানচাল করার জন্য নানা ধরনের অসৎ পদ্ধতি গ্রহণ করে বড় জমির মালিকরা দুর্নীতিপরায়ণ প্রশাসকদের সঙ্গে যুক্ত হবে। ফলে গ্রামাঞ্চলে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাবে।

Scanned with CamScanner